আজ সকালে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আমার ভিতরে কোনো দল নেই

আমার পিছনে কোনো দল নেই, আমার ভিতরে
দলবদ্ধ হবার আকাঙ্ক্ষা নেই, আমি
সাদা কালো লাল নীল গাং-গেরুউয়া জাফরান বাদামি
হরের রঙের খেলা দেখে যাই।
একলা-পথে হাঁটতে-হাঁটতে একলা আমি ঘরে
ফিরে যাব। যেতে-যেতে ধুলোবালি জঞ্জালে ও ঘাসে
খানিকটা প্রশংসা আমি রেখে যাই।
দেখি শুকনো পাতা উড়ছে হিলিবিলি সন্ধ্যার বাতাসে।

আমার পিছনে কেউ নেই এখানে। কস্মিনকালেও
কাউকে আমি ডাক দিয়ে বলিনি,
চলো যাই, রোদ্দুরে গলিয়ে নেব গিনি,
হাত বাড়িয়ে টেনে আনব অহঙ্কারী বটগাছের মাথা।

আমি বলি, দশজনে পঁচিশটা পথে যেয়ো,
প্রত্যেকে আড়াইটে করে পেয়ে যাবে শুকনো শালপাতা।

তার মানে কি এই যে, আমি রাখিনি বিশ্বাস
সঙ্ঘবদ্ধ কাজে?
দেখিনি কীভাবে কলে-কারখানায় বাঁধে ও ব্যারাজে
কিংবা পূর্তবিভাগীয় নির্মিতিমালায়
সভ্যতা নিষ্পন্ন হয়? বালিহাঁস
সরে গিয়ে জায়গা দেয় পৌরহিতসাধিনী সভাকে;
জলা ও জঙ্গল হটে যায়।
চৌষট্টি ফ্লাটের হর্ম্য মেঘের বালিশে মাথা রাখে।

সমস্ত দেখেছি আমি, বুঝেছি যে, মানুষের মিলিত উদ্যম
ব্যতিরেকে
এমন সহস্রফণা
উপরন্তু একই সঙ্গে এমন বিষাক্ত-মনোরম
উল্লাসের আবির্ভাব সম্ভব হত না।

কিন্তু এই সম্ভবপরতা তাকে কী দেয়, কতটা
দেয়, যে সভ্যতা অর্থে অন্য-কিছু বোঝে?
সভ্যতার ভিতরে যে খোঁজে
অন্য চরিতার্থতা, সে অন্য পথে যায়।
দলবদ্ধতার ঘটাপটা
দুই পায়ে মাড়িয়ে তাকে একবার নিজের মধ্যে উঁকি
দিয়ে কথা বলতে হয় নিজস্ব ভাষায়,
একবার দাঁড়াতে হয় নিজস্ব ইচ্ছার মুখোমুখি।

আমার ভিতরে কোনো দল নেই, দলবদ্ধতার
আনন্দ অথবা গ্লানি, কোনোটাই নেই।
আকাশে অজস্রবর্ণ খেলাধুলো সমাপ্ত হলেই
ফিরতি-পথে জঞ্জালে ও ঘাসে
খানিকটা প্রশংসা রেখে আমি দেখি, এন্তার...এন্তার
হিলিবিলি পাতা উড়ছে সন্ধ্যার বাতাসে।

আমি ও তিনি

আমি বললুম, "এটা কিছু নয়।"
তিনি বললেন, "এটাই
মন্দাকিনীর ধারা নিশ্চয়,
এতেই তৃষ্ণা মেটাই।"

আমি বললুম, "মন্দাকিনী কি
এত কাছে? এটা ছল।"
তিনি বললেন, "না, না, এটা ঠিকই
স্বর্গঙ্গার জল।"

আমি বললুম, "পিছনের টানে
ঠিক নয় বসে যাওয়া।"
তিনি বললেন ,"বইছে এখানে
অতি পবিত্র হাওয়া।"

আমি বললুম, "বসুন তা হলে,
স্নান করে হাওয়া খান,–

পাথরে পা রেখে আমি যাই চলে।”
তিনি বললেন, “যান।”

কালো অ্যাম্বাসাডর

কালো অ্যাম্বাসাডরের প্রসঙ্গ উঠতেই তাঁর কথা
অকস্মাৎ ঘুরে যায়
খুন, দাঙ্গা, রাহাজানি ইত্যাদির দিকে।
অতঃপর
কান টানলে যেমন মাথা আসে,
তেমনি করে এসে গেল
রাষ্ট্রনীতি, ইমার্জেন্সি, আইন-শৃঙ্খলা।
ভদ্রলোক অত্যন্ত আবেগ দিয়ে বলে যাচ্ছিলেন,
“অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, আশ্রয়, চিকিৎসা চাই, অবশ্যই চাই!
আরে বাবা,
এইসব উত্তম বস্তু কে না চায়? আমি কি চাই না?
চাই, চাই, একশো বার চাই।
কিন্তু তার আগে
ল অ্যাণ্ড অর্ডার চাই, সেইটেই এখন
সবচেয়ে জরুরি।”

কার জন্যে জরুরি, আমি প্রশ্ন করে উত্তর পাই না।

কিছু-বা কল্পনা

প্রত্যেকটা প্রসাদ কিছু শূন্যতা রচনা করে যায়,
আলোকিত মঞ্চের পিছনে থাকে অন্ধকার,

ট্রেন চলে যাবার পরে প্ল্যাটফর্মটা আবার
খাঁখাঁ করতে থাকে,
নিঃশব্দে বিছানা থেকে উঠে গিয়ে খোলা জানালায়
চক্ষু রাখে
মালবাবুর বউ,
এই ছোট্ট শহর ছেড়ে তার কখনও দিল্লি বা লখনউ যাওয়া হয়নি।

খানিকটা এগিয়েছিল, তারপর–কে জানে কেন–এগোয়নি
জেলা-বোর্ডের রাস্তাটা,
ছায়ায়-ছায়ায় হাঁটতে হাঁটতে লোকটা গিয়ে ঠাঠা-
রোদ্দুরের মধ্যে নেমে পড়ে,
চক্রাকারে ঘুরতে-ঘুরতে কিছু-একটা নির্ভুল তাক করে
নেমে আসে চিল।

চার-পাঁচ দশক ধরে এই সমস্ত দৃশ্যের মিছিল
দেখে যাচ্ছে কবি।
কিছু দেখছে, কিছু-বা-কল্পনা করছে। তার বাগানের সমস্ত করবী
সাদা নয়, কিছু হলদে, কিছু লাল।
সে তার সকাল
থেকে কিছু ফুল কুড়িয়ে আস্তেসুস্থে হেঁটে চলে যায়
পড়ন্ত সূর্যের দিকে। আমরা তার যাওয়া দেখতে থাকি। রৌদ্র নেই, এখন ছায়ায়
তার পাকা চুলের মধ্যে খেলা করছে বিকেলের হাওয়া।

খুকুর জন্য

যার যেখানে জায়গা, যেন সেইখানে সে থাকে।
যা মনে রাখবার, যেন রাখে
নিতান্ত সেইটুকু।
খুকু,
ঘরে একটা জানলা চাই, বাইরে একটা মাঠ।
উঠোনে একটিইমাত্র কাঠ-
গোলাপের চারা
আস্তেসুস্থে বড় হোক, কিচ্ছু নেই তাড়া।
একদিন সকালে
নিশ্চয় দেখব যে, তার ডালে
ফুল ধরেছে। খুকু,
তার-কিছু তো চাইনি, আমি চেয়েছি এইটুকু।

জানকী-চটি

রাত্রে নেমে আসে দুগ্ধধবল পাহাড়
জানলার উপরে।
ঘরে আলো নেই, কিন্তু সমস্ত আকাশে খেলা করে
শুক্লা যামিনীর জ্যোৎস্না। মনে হয়,
কস্মিনকালেও কোনো ইঁদুরের ঘাড়
বেড়ালের দাঁতে
ছিন্ন হয়নি, অথবা সময়
কখনও খণ্ডিত হয়নি দণ্ড-মাস-বর্ষের করাতে।

এ কি ছবি? রোয়েরিখ যেমন আঁকতেন? তা তো নয়।
কার্পাসের মতো লঘু মেঘ
জ্যোৎস্নার ভিতরে দিব্য ভেসে যায়। একটুও উদ্বেগ
জমে না দিগন্তে। আমি শীতে
জানলায় বিনিদ্র বসে ভাবি যে, নিশ্চয়
যুদ্ধ নিরর্থক বলে বুঝে গেছে ঝর্না ও পাহাড়
মাটির খানিকটা ঊর্ধ্বে, জানকী-চটিতে।
আরও ঊর্ধ্বে রাত্রি জাগে ত্রিকাল-বিধৃত গ্লেসিয়ার।

তা নইলে

কিছু পেলে কিছু দিয়ে দিবি,
তা নইলে পৃথিবী
চলতে-চলতে একদিন চলবে না।

আকাশে ঘনিয়ে আসবে ঘোর
অন্ধকার, তোর
ঘরে-বাইরে কেউ কথা বলবে না।

দরজায় লাগানো ছিল তালা,
বেলকুঁড়ির মালা
পড়ে ছিল রজ্জুর সমান।

লুন্ঠন করেছ পুষ্প সব,
অথচ সৌরভ
এক-কণা করোনি কাউকে দান।

কিছু যত পাচ্ছে, প্রতিদিন
জমছে তত ঋণ।
একটু তার শোধ করো এবারে।

নইলে খসে পড়বেই ঘরবাড়ি,
সূর্য দেবে আড়ি
বিশ্ব ডুবে যাবে অন্ধকারে।

তোমার জন্য ভাবি না

তুমি তোমার ছেলেকে
অহোরাত্রি অসংখ্য মিথ্যার বিষ গলিয়েছ।
শৈশবে সে হাসেনি,
কেননা
সমবয়সীদের সে শত্রু বলে জানত।
যৌবনে সে নারীকে ভালবাসেনি,
কেননা
নারীকে সে নরক বলে জানে।
ধীরে-ধীরে সেই অকালবার্ধক্যের দিকে সে এখন
এগিয়ে যাচ্ছে,

চুলগুলিকে যা সাদা করে দেয়,
কিন্তু চিত্তের মালিন্য যা মোচন করতে পারে না।

তোমার জন্য আমার কোনো ভাবনা নেই,
কিন্তু
তোমার ছেলের জন্য আমার বড় দুঃখ হয়।

তুমি তোমার মেয়েকে
অহোরাত্রি অসংখ্য কুৎসার কালি
গিয়িয়েছ।
শৈশবে সে ফুল কুড়ায়নি,
কেননা সে শুনেছিল
প্রত্যেকটা গাছেই আছে একানড়ের বাসা।
যৌবনে তার জানলা দিয়ে বাতাস বয়ে যায়নি,
কেননা
প্রতিবেশীর পুত্রকে সে লম্পট বলে জানে।
ধীরে-ধীরে সে এখন সেইদিকে এগিয়ে যাচ্ছে,
যেখানে
দুপুরগুলি বিকেলের মতো বিষণ্ণ তার
বিকেতোমার জন্য আমার কোনো ভাবনা নেই,
কিন্তু
তোমার মেয়ের জন্য আমার বড় দুঃখ হয়লগুলি রাত্রির মতো অন্ধকার।

পাতাগুলি

পাতাগুলি উল্টেপাল্টে নিজেকে দেখায়
যখনই বাতাস এসে নাড়া দিয়ে যায়
বৃক্ষের বাড়িতে
অশ্বত্থের পাতা
এক্ষুনি সবুজ, কিন্তু পরক্ষণে সাদা।

হাক্লান্ত দৌড়চ্ছে গাড়ি, মস্ত একটা ফিতে
খুব দ্রুত গুটিয়ে তুলছে কেউ,
রোদ্দুরে ঝিমোচ্ছে শক্ত লালমাটির ঢেউ
দিগন্ত অবধি।
এইবারে কপালক্রমে রোগা ও তিরতিরে একটা নদী
পেয়ে গেলে ছবিটা সম্পূর্ণ হতে পারে।

বলতে-না-বলতেই গাড়ি পৌঁছে গেল নদীর কিনারে।

নদী তো ভাবনায় ছিল, সামনে এসে দাঁড়াল কখন!
পাথরে পা রেখে জলে তক্ষুনি দুইজন
নেমে গেল। রৌদ্র ঝরে, হাওয়া ঘুরে যায়।
দুটি পাতা উল্টেপাল্টে নিজেকে দেখায়।

হেমলতা

কিছু কথা অন্ধকারে বিদেশে ঘুরছে,
কিছু কথা বাতাসে উড়ছে,
কিছু কথা আটকে আছে পাথরের তলে,
কিছু কথা ভেসে যাচ্ছে কাঁসাইয়ের জলে,
পুড়তে-পড়তে শুদ্ধ হয়ে উঠছে কিছু কথা।

হেমলতা,
তুমি কথা দিয়েছিলে, আমি দিতে এখনও পারিনি,
তাই বলে ছাড়িনি
আজও হাল।

বাতাসে আগুনে জলে উদয়াস্ত আজও মায়াজাল
টেনে যাচ্ছি, জোড়-মেলানো কথা
যদি পাই, তোমাকেই দেব। হেমলতা,
এক্ষুনি ভেঙে না তুমি ঘর।
ধৈর্য ধরো, ভিক্ষা দাও আর মাত্র কয়েকটি বছর।